ভূমিকা

মহাভারতের অনুক্রমণিকায় ব্রহ্মা ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যে ভাবী কালে মহাভারতের কাহিনি সকল মুখ্য কবিদের উপজীব্য হবে–''সর্বেষাং কবিমুখ্যানামুপজীব্যো ভবিষ্যতি।'' সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাস, ভাস প্রমুখের নাটকে মহাভারতীয় আখ্যান বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। তাঁরা নাটক রচনার ক্ষেত্রে মূল আখ্যান থেকে সরে এসে কোথাও কোথাও শৈল্পিক স্বাধীনতার পরিচয় দিয়েছেন এবং তাঁদের নাটকগুলি পৌরাণিক অভিধেয় নয়, নাটকই। বাংলা নাটক সংস্কৃত নাটকের নিছক অনুবাদ বা অনুকরণ নয় এবং গ্রাম্য যাত্রার মার্জিত রূপও নয়, প্রধানত ইংরেজি চর্চার ফল বলা যেতে পারে। জন্মলগ্ন থেকেই নাট্যবিষয় রূপে মহাভারতের কাহিনি অবলম্বন ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাকেই অনুসরণ করেছে। চিরাচরিত পৌরাণিক আখ্যানগুলি নাট্যরূপায়ণের ক্ষেত্রে বাঙালি পরিমণ্ডলে কৃত্তিবাস ও কাশীরামের কাব্যের অত্যন্ত জনপ্রিয়তা নাট্যকারদের প্রলুব্ধ করেছে। প্রথম দিকের পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে অধিকাংশ নাট্যকারই মূলত কাশীরামকে প্রায় অনুসরণ করেছেন।

মহাভারতের অনেক কাহিনি কাশীরামের কাব্যে নেই আবার কাশীরাম নিজেও কিছু নতুন কাহিনি সংযোজন করেছেন। কাশীরামের রচনা সম্পর্কে মহাভারত সমালোচক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী অসাধারণ ব্যাখ্যা করেছেন 'মহাভারতের অষ্টাদশী' গ্রন্থে –

> ''মিথ মানেই তো এক নিজ্ঞান সত্য, এখানে সাহিত্যসৃষ্টি বা জীবনবোধ কোনও একগুঁয়ে শাস্ত্র মেনে চলে না। অতএব কাশীরাম যেভাবে দেখেছেন, তার মধ্যেও এক অন্যতর সত্য আছে, যা হলেও হতে পারত।''

নাটকের বিষয়বস্তু রূপে মহাকাব্য থেকে কাহিনি চয়ন প্রসঙ্গে নাট্যসমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন –

''রামায়ণ কিংবা মহাভারত হইতে কাহিনী সংগ্রহ করিয়া রচনার একটা খুব বড় সুবিধা এই যে, ইহা দ্বারা ইহাদের পরিচিত পরিবেশটির সদ্ব্যবহার করিবার সুযোগ লাভ করা যায়। শুধু তাহাই নহে, চরিত্রগুলির সঙ্গেও পাঠকের যে মনোভাব প্রায় আজন্ম সংস্কারের মতই গড়িয়া উঠে, তাহারও পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা যায়। অবশ্য আর একদিক দিয়া ইহার দায়িত্বও অনেক বেশি–নূতন করিয়া ব্যবহারের ফলে চরিত্রগুলি যদি আমাদের চিরকাল পালিত সংস্কারের তিলমাত্রও বিরোধী হইয়া পড়ে, তাহা হইলেই তাহাদের প্রতি আমাদের মন অতি সহজেই বিরূপ হইয়া যায়।''

প্রাচীন সাহিত্য থেকে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি ও দুই কালের কবি সাহিত্যিকদের প্রবণতা সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী 'রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ' গ্রন্থে লিখেছেন –

''সাহিত্যিকগণ অনেক সময়েই তাঁহাদের রচনার মূল প্রচীন গ্রন্থ হইতে নিয়া থাকেন এবং নিজের প্রয়োজন ও রুচি অনুসারে পরিবর্জন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং নূতন অর্থারোপ করিয়া থাকেন। এইসব প্রক্রিয়ার দ্বারা পুরাতন কাহিনী তাঁহার স্বকীয় হইয়া ওঠে এবং এই স্বকীয়তার মধ্যে কবির বিশেষ পরিচয় থাকিয়া যায়। মূল কাহিনীটা অনেক পরিমাণে বাঁশের কঞ্চিখানার মতো, তাহাকে অবলম্বন করিয়া যে বল্লরী বিতানিত হয়, সেইটাই সমালোচকের লক্ষ্য হওয়া উচিত। মহাভারত হইতে কালিদাস শকুন্তলার কাহিনী লইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার শকুন্তলা ও মহাভারতকারের শকুন্তলা স্বরূপত ভিন্ন। মূল কাহিনীকে পরবর্তী কবি যে কেবল নাট্যরূপ দিয়াছিলেন তাহাই নয়, ওই নাট্যরূপের মধ্যে কবির স্বরূপও রহিয়া গিয়াছে। . . .প্রাচীন কবিগণ জগৎ ও জীবনের রাজপথগুলির যাত্রী ছিলেন; গলি, উপগলি ও অন্ধিসন্ধির সন্ধান বড় রাখিতেন না। কাব্যের চরিত্রগুলিকেও তাঁহারা মোটা তুলিতে আঁকিতেন, ছায়াতপের দ্বারা সূক্ষ্ম বর্ণবিলাস ফুটাইবার দিকে তাঁহাদের ঝোঁক ছিল না। অর্বাচীন কালের কবিরা সংসারের রাজপথ ছাড়িয়া গলিঘুঁজি বাহিয়া মানবচিত্তের সূক্ষ্ম রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রাচীনদের এ-সব সূক্ষ্ম কাজের দিকে মন ছিল না।''

পৌরাণিক আখ্যান উপাখ্যানগুলি বহুকাল ধরে কথিত বা গীত হয়ে আসছে কথক ঠাকুর বা গায়েনের মাধ্যমে, আর সাহিত্যিক উপস্থাপন করছেন গল্প-উপন্যাসে, কাব্য-নাট্য-সমালোচনায়।

কথক বা গায়েন যখন আখ্যানাদি উপস্থাপন করেন তখন তাঁদের নিজস্ব রঙ-ঢঙ-সঙ যেমন মিশিয়ে দেন, সাহিত্যিকও একই রকম বচন-কথন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাঁর মতো করে উপস্থাপন করে থাকেন। নাট্যকারদের সমাজভাবনা, রাজনৈতিক চেতনা, শিক্ষা-রুচি ও জীবনদর্শনের ছায়া এসে পড়ে তাঁদের রচিত নাটকে। তখন পৌরাণিক চরিত্রগুলির রূপান্তর ঘটে, স্বর্গের বা দেবদেবীর কাহিনির রূপকে বর্তমান যুগের সমস্যা-সঙ্কট চিন্তাভাবনা প্রকট হয়ে ওঠে। পুরাণ কাহিনিকে ভেঙে অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান কবি সাহিত্যিক নাট্যকাররা।

মধ্যযুগের যাত্রাপালা বা গীতাভিনয়ে কাহিনির একটা খসড়া থাকে, গানই সেখানে মুখ্য বিষয়। সংযোগ স্থাপনের জন্যে কিছু কিছু সংলাপের সাহায্যে কাহিনি-সূত্র ধরে দেওয়া হয় মাত্র। কিন্তু নাটকে অঙ্ক দৃশ্যে বিভাজিত সুবিন্যস্ত প্লট নির্মাণের জন্য কাহিনির অন্বেষণে পুরাণ তথা মহাকাব্যকে আশ্রয় করেছেন প্রথম পর্বের নাট্যকাররা। যেসকল চরিত্রগুলি নাটকে থাকে তাদের কাজ কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ফলে চরিত্র চিত্রণের পৃথক প্রয়াস খুব বেশি লক্ষ্য করা যায় না। নাট্য চরিত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তব্যের মাধ্যমে ঘটনার বিবৃতি করেছেন। বাংলা পৌরাণিক নাটকের কালপর্বে রামায়ণের মতোই মহাভারতের আখ্যানও নাট্যকাহিনির আকরিক স্তরে প্লট নির্মাণে বহু বিচিত্র ঘটনার উপাদান সরবরাহ করেছে।

মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সম্পত্তির অধিকার নিয়ে একই পরিবারের দুই পক্ষের পারস্পরিক সংঘাতের পরিণাম। দুর্যোধন একটি ক্রোধময় দুর্ধর্ষ বৃক্ষ। এই বৃক্ষের স্কন্ধ হলেন কর্ণ, শাখা শকুনি, বিকশিত পুষ্প ও পরিণত ফল হল দুঃশাসন এবং অবিবেকী রাজা ধৃতরাষ্ট্র হলেন মূল। পক্ষান্তরে, যুধিষ্ঠির ছিলেন একটি ধর্মময় উৎকৃষ্ট বৃক্ষ। অর্জুন হলেন এই বৃক্ষের স্কন্ধ, ভীম হলেন শাখা, বিকশিত ফুল ও পরিণত ফল হলেন নকুল ও সহদেব এবং শ্রীকৃষ্ণ, বেদ ও ব্রাহ্মণেরা ছিলেন এই বৃক্ষের মূল। মহাভারতের ভূমিকায় সংক্ষিপ্তাকে দুটি পক্ষের বিবরণ একটি শ্লোকে উপস্থাপন করা হয়েছে -

''দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখাঃ।
দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোহ মনীষী।।
যুধিষ্ঠিরো ধর্মময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধোর্জুনো ভীমসেনোহস্যশাখাঃ।
মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ।।''

অষ্টাদশ পর্বের সুবিশাল মহাভারতের মূল কাহিনি আশ্রয়ী নাটকের পাশাপাশি উপকাহিনি নির্ভর নাটকের সংখ্যাও কম নয়। আলোচ্য গবেষণার **'মহাভারত আশ্রয়ী বাংলা নাটক : ১৮৫২-১৯১২'** লক্ষ্য উনিশ শতকে বাংলা নাটকের জন্মলগ্ন থেকে বিশ শতকে পৌরাণিক নাটকের ঋত্বিক গিরিশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বিশিষ্ট নাট্যকারদের নাটকে মহাভারতের পুনর্নির্মাণের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য প্রবণতার যে বিবর্তন ঘটেছে তা অনুসন্ধান করা এবং পরবর্তী কালের নাটকে এসকল পৌরাণিক নাটকের প্রভাব কতটা তা আবিষ্কার করা।

সৌখিন রঙ্গালয়ের যুগ থেকেই বাংলা নাটকে মহাভারতের অনিবার্য ও প্রায় সর্বগ্রাসী প্রভাব লক্ষণীয়। তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২) নাটকে মহাভারতের আদিপর্বে অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা হরণের বৃত্তান্ত গৃহীত হয়েছে। এক্ষেত্রে কাশীরাম দাস নাট্যকারের প্রধান অবলম্বন। ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের সভায় নারদ মুনি উপস্থিত হয়ে দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের সম্পর্ক নিয়ে নির্দিষ্ট শর্ত আরোপ করেন। একদিন যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী যখন বিশ্রাম্ভালাপেরত ছিলেন সেই সময় সহসা অর্জুনের আগমন ঘটে। শর্তানুসারে অর্জুনকে বারো বছরের জন্য নির্বাসনে যেতে হয়। তীর্থ পর্যটনে অর্জুন দ্বারকায় উপস্থিত হলে বলরাম দুর্যোধনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহ ঠিক করেন। কিন্তু সুভদ্রার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী অর্জুন কৃষ্ণের প্রশ্রয়ে ও সত্যভামার প্রচেষ্টায় সুভদ্রাকে হরণ করে নিয়ে যান এবং দুর্যোধন আশাহত হয়ে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন

করেন। তারাচরণ শীকদারের নাটকে মূলের বিশেষ বিচ্যুতি নেই, তবে অর্জুন চরিত্রটির মহিমা ঈষৎ কালিমালিপ্ত হয়েছে। তাঁর নাটকে পৌরাণিক কাহিনি এবং পৌরাণিক চরিত্র আছে কিন্তু আলৌকিক কাহিনি বা ঘটনা দৃশ্যাদি নেই, ভক্তি বিশ্বাস অপেক্ষা বিদ্যাসুন্দরের প্রভাবজাত প্রেম-মিলনের অতিরাগ ও মদ্যপায়ী চরিত্রের স্থূলতা নাটকের প্রতিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। বাস্তবিক তারাচরণ শীকদার পাশ্চাত্য নাট্যরীতি এবং নাট্যভাবনার দ্বারা পরিচালিত হয়েই বাঙালির ভক্তিভাব ও বাঙলার নিজস্ব শিল্পরীতি অনুধাবন করতে না পারায় ভদ্রার্জুন প্রকৃত পৌরাণিক নাটক হয়ে উঠতে পারে নি।

হরচন্দ্র ঘোষ পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ মেনে শেক্সপীয়রের ছায়াবলম্বনে মহাভারতের কাহিনি নিয়ে ‘কৌরব বিয়োগ’ (১৮৫৭) নাটক রচনা করেন। আধুনিক শিক্ষিত মানুষের রুচির দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি প্রচলিত কাহিনির নাট্যরূপান্তর করেছেন। নাটকটি মহাভারতের শল্যপর্ব, সৌপ্তিকপর্ব, স্ত্রীপর্ব, শান্তিপর্ব ও আশ্রমবাসিকপর্বের আখ্যান অনুসরণে রচিত হয়েছে। নাটকের ভূমিকায় হরচন্দ্র জানিয়েছেন, ‘‘রাজা দুর্যোধনের ঊরু ভাঙ্গাবধি ও অন্ধবরাজাদির যজ্ঞানলে দগ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপূর্ব বৃত্তান্ত সুমার্জিত সাধু ভাষায় বহুলাংশ গদ্যছন্দে ও অতি স্বল্পাংশমাত্র পদ্যপ্রবন্ধে ইংলন্ডীয় নাটকের প্রচলিত প্রণালীতে রচনা করিয়া ‘কৌরববিয়োগ নাটক’ এই আখ্যাদানে প্রকাশ করিলাম।’’ পান্ডিত্যপূর্ণ সাধু ভাষার প্রয়োগে নাটকের গতিশীলতা ক্ষুন্ন হয়েছে। নীতি উপদেশ ও তত্ত্ব প্রচার এবং দীর্ঘ সংলাপ স্বাভাবিকতার পরিপন্থী।

রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাভারতের কাহিনি অনুসরণে মৌলিক নাটক ‘রুক্মিণীহরণ’ (১৮৭১) রচনার পূর্বে সংস্কৃত নাট্যকার ভট্টনারায়ণ ও কালিদাসের ‘বেণীসংহার’ (১৮৫৬) ও ‘অভিজ্ঞান শকুন্তল’ (১৮৬০) নাটকের অনুবাদ করেন। মহাভারতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এই তিনটি নাটক ছাড়াও ‘রত্নাবলী’(১৮৫৮), ‘মালতী মাধব’(১৮৫৯), নাটকের অনুবাদ এবং ‘কংসবধ’ (১৮৭৩), ‘ধর্মবিজয়’(১৮৭৫) নাটক রচনার মধ্য দিয়ে পুরাণের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ব্যক্ত হয়েছে।

‘রুক্মিণীহরণ’ নাটকটি সম্পর্কে সুশীল কুমার দে ‘নানা নিবন্ধ’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘‘নাটকটির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার ভাষা বেশ সহজ ও সরল, এবং ইহার পরিকল্পনায় একটি হাস্যরস-সমুজ্জ্বল মনোরম নূতনত্ব রহিয়াছে। চরিত্রগুলি প্রাচীন, পুরাণসিদ্ধ ও পূজ্যস্থানীয় হইলেও আধুনিক সময়ের সাধারণ জীবন্ত মানুষের মত প্রায় প্রত্যেকটি সৃষ্ট হইয়াছে, এবং anachronism বা স্থান-কালের অনৌচিত্যের প্রতি বিরাগ নাট্যকারের নাই বলিলেও চলে। . . . কতগুলি ভাবগদ্‌গদ বা গম্ভীর দৃশ্য ছাড়িয়া দিলে, সমস্ত নাটকটি কুলীনকুলসর্বস্ব-রচয়িতার লেখনীর উপযুক্ত হইয়াছে।’’

বেণীসংহার নাটকের কাহিনি মহাভারতের উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও শল্যপর্বের আখ্যানভাগ অনুসরণ করেছে। দীর্ঘ বনবাস অতিক্রম করে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে আসার পর থেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধান্তে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত এই নাটকের ব্যাপ্তিকাল। মহাভারত থেকে রামনারায়ণের নাটকের রূপান্তর মূলত পরোক্ষ। সংস্কৃত ‘বেণীসংহারম্’ নাটকে ভট্টনারায়ণ মহাভারতীয় কাহিনির যে রূপান্তর ঘটিয়েছেন রামনারায়ণ তা থেকে খুব বেশি বিচ্যুত হননি। তবে ভট্ট নারায়ণের নাটকের ভাষার গাম্ভীর্য ওজস্বিতাকে রামনারায়ণ চলিত বাংলায় রূপান্তর করে মহাকাব্যিক দূরত্ব লঙ্ঘন করেছেন যা উনিশশতকীয় বাঙালি র্দশকের রুচিবোধকে তৃপ্ত করে।

রামনারায়ণ নাটকের ‘অভিজ্ঞান শকুন্তল’ ভূমিকায় জানিয়েছেন, ‘‘সুপ্রসিদ্ধ মহাকবি কালিদাসের কবিত্বসৌরভের কল্পদ্রুমতুল্য যে অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক তাহা আমি অনুবাদ করিয়াছি– অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া অধুনাতন নিয়মানুসারে নাটক অভিনয়োপযোগী করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে অনেক রসভাবাদি পরিবর্তিত পরিত্যক্ত ও সন্নিবেশিত করিয়াছি, এতাদৃশ সাহসিক যথেচ্ছাচারিতায় আমি পাঠক মণ্ডলীর রোষ বা পরিতোষের পাত্র হইলাম বলিতে পারি না।’’

মহাভারতের যযাতি-দেবযানী-শর্মিষ্ঠার কাহিনি অবলম্বনে মধুসূদন দত্ত ‘শর্মিষ্ঠা’ (১৮৫৯) নাটক রচনা করেন। সংস্কৃত নাট্যরীতি ও পাশ্চাত্য নাট্যরীতির সমন্বয়ে শর্মিষ্ঠা নাটকে

পৌরাণিক ভাবনা চিন্তা, আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ভাবঋদ্ধতা অপেক্ষা দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার প্রেমের জটিলতা-ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব এবং প্রেমের নিষ্ঠাই প্রাধ্যান্য লাভ করেছে। কাহিনি নির্মাণে, চরিত্র চিত্রণে আধুনিক এবং পাশ্চাত্য ন্যট্যরীতিই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

বাংলা পৌরাণিক নাট্যকারদের মধ্যে খুব কম জনই পেরেছেন নিজেদের নাটকে পুরাণ কথাকে এভাবে আধুনিক তাৎপর্যে পুনগঠিত ও সম্প্রসারিত করতে। মধুসূদনের জীবনীকার গোলাম মুরশিদ 'আশার ছলনে ভুলি' গ্রন্থে লিখেছেন, ''খুব সম্ভব হেনরিয়েটার সঙ্গে তাঁর প্রণয়ের খবর আবিষ্কার হবার ফলেই তাঁর সংসার নাটকীয় ভাবে ভেঙ্গে গিয়েছিল। দেবযানীর মতো রেবেকাও যদি এমনি আকস্মিক ভাবেই হেনরিয়েটার সঙ্গে কবির গোপন প্রেমের কথা জেনে থাকেন, তাহলে আশ্চর্য হবার কারণ নেই। এমন কি এই গোপন কথা প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর কোনো সন্তানের ভূমিকা থাকাও একেবারে অসম্ভব নয়।''

নাটকে শর্মিষ্ঠা ও যযাতির গোপন দাম্পত্যের কথা জানাবার পরে দেবযানী ক্ষোভে ও দুঃখে পিতা শুক্রাচার্যের কাছে প্রথমে ফিরে গেলেও পরে শুক্রাচার্যের মধ্যস্থতায় দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার মধ্যে পূর্বপ্রণয় পুনর্জাগ্রত হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে যে সমাধান কোনোদিনো পাননি, পুরাণ কাহিনির মধ্যে আশ্রয় নিয়ে সেই অচরিতার্থ স্বপ্নকেই অবয়ব দিতে চেয়েছেন মধুসূদন।

হিন্দুমেলার অন্যতম কর্ণধার মনোমোহন বসু বাঙালির স্বাজাত্যবোধ জাগ্রত করতে পুরাতনের অনুবর্তন করেছেন। তিনি মহাকাব্যের সুবিশাল পরিধির মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আনুসন্ধান করেছেন এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথও এই পথেই নিজেদের শিকড় খুঁজে পেয়েছিলেন। মহাভারতের কাহিনি অনুসারে তিনি 'সতী নাটক'(১৮৭৩) ও 'পার্থ পরাজয়'(১৮৭৫) নাটকে ইংরেজি বা সংস্কৃত নাটকের অনুকরণ না করে দেশজ রীতিতে পরিবেশন করেছেন। তিনি প্রচলিত যাত্রার আঙ্গিকে গানের সংখ্যা বৃদ্ধি করে যে গীতাভিনয়ের

সৃষ্টি করলেন তা একদিকে যেমন আধুনিক নাটকের নিকটবর্তী হল আবার যাত্রার নিম্ন রুচিকেও পরিহার করতে সমর্থ হল।

প্রাক্-গিরিশচন্দ্র যুগের পৌরাণিক নাটকগুলি পুরাণ কাহিনি ও চরিত্র অবলম্বন করে রচিত হলেও পাশ্চাত্য নাট্যরীতির প্রয়োগ কৌশল এবং নবজাগরণের আলোকপ্রাপ্ত নাট্যকারের চিন্তভাবনা যুক্তি সমন্বিত আধুনিক মনই বড় হয়ে উঠেছে। ভারতীয় ধর্ম দর্শনের আদর্শ, ভক্তিভাব, আবেগ, পাপ-পুণ্য সত্যাসত্যের দ্বন্দ্বে সত্যের জয় এবং শান্তরস ও ভক্তি রসের প্রতিষ্ঠা– গিরিশ যুগের পৌরাণিক নাটক গুলির আদর্শ পূর্ববর্তী নাট্যকারদের নাটকে তেমনভাবে প্রকাশ পায় নি। গিরিশচন্দ্র 'পৌরাণিক নাটক' প্রবন্ধে লিখেছেন, ''ভারতবর্ষের জাতীয় মর্ম্ম–ধর্ম। দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি যত প্রকার কথা আছে, তাহাতে কেহ ভারতের মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারিবেন না। . . .হিন্দুস্থানের মর্ম্মে মর্ম্মে ধর্ম। মর্ম্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।''

মহাভারত কাহিনি অবলম্বনে গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলি হলো- অভিমন্যুবধ (১৮৮১), পান্ডবের অজ্ঞাতবাস (১৮৮২), দক্ষযজ্ঞ (১৮৮৩) নলদময়ন্তী (১৮৮৩), প্রহ্লাদ চরিত্র (১৮৮৪), শ্রীবৎসচিন্তা (১৮৮৪), জনা (১৮৯৪), পান্ডব গৌরব (১৯০০)। এই নাটকগুলিতে গিরিশচন্দ্র মূলত কাশীরামের আখ্যান অনুসরণ করেছেন।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যিক প্রতিভার সহজ ও স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য পৌরাণিক নাটক রচনায়। তাঁর আগে পর্যন্ত পুরাণকাহিনি নিয়ে নাটক রচনা যাত্রাপালা ও গীতাভিনয়ের একটি ভিত গড়ে উঠেছিল, গিরিশচন্দ্র সেই ভিতের ওপর পৌরাণিক নাটকের ইমারত গড়ে তুললেন। বাঙালি জাতির হৃদয়ের আর্তি, ধর্মপ্রাণতা, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার ঐতিহ্য, পুরাণ ঐতিহ্য এবং পুরাণের প্রতি নাড়ীর টান–গিরিশচন্দ্র গভীর ভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর হাতে পৌরাণিক নাটক নতুন মাত্রা লাভ করেছে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষকে অনুসরণ করে বাংলা নাট্যসাহিত্যে যেসকল নাট্যকার আবির্ভূত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ রায়ই সর্বপ্রধান। গিরিশচন্দ্রের ভক্তিবাদের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশিত হয়েছে। ভক্তি, বিশ্বাস ও আত্মসমর্পনের মধ্যে সেখানে কোনও দ্বিধা সংশয় বা কামনা নেই। রাজকৃষ্ণের ভক্তিবাদের সঙ্গে মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যের আধ্যাত্মিক আদর্শের সংমিশ্রণ লক্ষকরা যায়। রাজকৃষ্ণ রায়ের মহাভারত আশ্রয়ী নাটকগুলি হলো- যদুবংশ ধ্বংস (১৮৮৪), প্রহ্লাদ চরিত্র (১৮৯১), দুর্বাসার পারণ, ভীষ্মের শরশয্যা।

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাট্যধারার অন্যতম অনুসারী। পৌরাণিক যাত্রাপালা, গীতাভিনয় এবং গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের জনপ্রিয়তা দেখে তিনি বুঝেছিলেন যে, ধর্মপ্রাণ বাঙালি সামাজিক নাটক বা প্রহসন অপেক্ষা যে পৌরাণিক নাটকেই বেশি তৃপ্তি পায়। সমসাময়িক মঞ্চের দাবি মেটাতে তিনি অনেকগুলি নাটক লিখেছেন। পৌরাণিক নাটক রচনা করতে গিয়ে তিনি গৈরিশছন্দ ও মাইকেলী অমিত্রাক্ষরের ব্যর্থ অনুকরণ করেছেন। মহাভারতের কাহিনি অনুসরণে তাঁর রচিত নাটকগুলি হলো - দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর (১৮৮৪), রাজসূয় যজ্ঞ (১৮৮৫), পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ (১৮৮৯), সুভদ্রা-হরণ, দুর্যোধন-বধ, পান্ডব নির্বাসন, ভীষ্ম-মহিমা।

মহাভারতের আখ্যান আশ্রয় করে নতুন সাহিত্য নির্মাণের যে প্রয়াস উনবিংশ শতকে শুরু হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ সেখানে অন্যতম স্থান অধিকার করে আছেন। সমালোচক ক্ষুদিরাম দাস ‘রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়’ গ্রন্থে কাব্যনাট্যগুলির মূল্যায়ন করেছেন- ‘‘চিত্রাঙ্গদায় নারীত্ব সম্বন্ধে, বিদায় অভিশাপে প্রণয় মহিমা সম্বন্ধে এবং গান্ধারীর আবেদন ও নকরবসে মানবধর্ম সম্বন্ধে কবির একটি বিশেষ ভাবুকতাই এদের কবিহৃদয়ে স্বীকরণকে নিরুপিত করেছে। চিত্রাঙ্গদায় কাব্যের অতিরিক্ত কবির যে সূক্ষ্ম আদর্শবোধ প্রকাশিত হয়েছে তা বোধ হয় এই যে, পুরুষের যৌন আকর্ষণে নারীর রূপ অনেকাংশে কাজ করলেও নারীকে ভোগের বস্তুরূপে দেখলে অকৃতার্থ হয় পুরুষ নিজেই। বিদায়-অভিশাপ খণ্ডকাব্যে করুণরসের মধ্য দিয়ে প্রতিপন্ন করা

হয়েছে কর্তব্য থেকে প্রেমের মর্যাদা গুরুতর। কর্ণ-কুন্তী-সংবাদে মাতৃধর্মের নৃশংস অবহেলা দেখানো হয়েছে, গান্ধারীর আবেদনে রাজনীতি ও রাজধর্মের নৃশংস কর্তব্যকে পাপ ও অধর্ম বলে ঘোষণা করা হয়েছে, আর নরকবাসে শাস্ত্র ও প্রথার আনুগত্যের নিষ্ঠুর দিক উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে।''

কচ ও দেবযানীর কথা নিয়ে রচিত 'বিদায় অভিশাপ'(১৩০০) এবং সোমক রাজার কাহিনি নিয়ে রচিত 'নরকবাস'(১৩০৪) তুলনায় মহাভারত কাহিনির অধিক সংলগ্ন। অন্যদিকে 'চিত্রাঙ্গদায়'(১২৯৮) রবীন্দ্রনাথ মহাভারত আখ্যানকে স্পর্শ করেছেন মাত্র। 'গান্ধারীর আবেদন'(১৩০৪) ও 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদে'(১৩০৬) মহাভারত কহিনির কঙ্কালে যেন রবীন্দ্রনাথের শরীরস্থাপন। তবে এই পর্বের পাঁচটি রচনার সবকটিতেই তিনি প্রয়োজনমত পরিবর্তন-পরিবর্ধন-সংযোজন করেছেন।

গিরিশোত্তর যুগে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বিংশ শতাব্দীর নতুন পরিবেশে পৌরাণিক নাটকের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটাতে চেয়েছিলেন। পৌরাণিক নাটক রচনা করতে গিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ মূলত মহাভারত থেকেই চরিত্র নির্বাচন করেছেন। তিনি 'বভ্রুবাহন' (১৯০০), 'সাবিত্রী' (১৯০২), 'উলুপী' (১৯০৬), 'ভীষ্ম' (১৯১৩) -ইত্যাদি নাটকের মধ্যে যে পুরাণ দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, জীবনের অন্তিম পর্বে 'নরনারায়ণ' (১৯২৬) নাটকে তারই প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হন। নাটকগুলির বিশ্লেষণে মহাভারতীয় চরিত্রের পুনর্নির্মাণের বিষয়টি আলোচ্য গবেষণার অন্যতম স্থান অধিকার করে।

দ্বিজেন্দ্রলাল পুরাণ আশ্রয়ী নাটক রচনা করতে গিয়ে প্রচলিত নাট্যধারাকে প্রবল আঘত করলেন। মনোমোহন বসুর পূর্ব পর্যন্ত পুরাণ-কাহিনি অবলম্বনে নাটক রচনা করতে গিয়ে নাট্যকাররা পুরাণকে সোজাসুজি অনুসরণ করেছেন। মনোমোহন বসু এবং রাজকৃষ্ণ রায়ের পৌরাণিক নাটকে তরল ভক্তিরস, যাত্রাসুলভ আঙ্গিক এবং প্রচুর গানের বাহুল্য লক্ষণীয়।

গিরিশচন্দ্রও ধর্মকথা প্রচারের বাহনরূপে পৌরাণিক নাটককে গ্রহণ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরাণিক নাটকে আধুনিক মনোভাব নিয়ে আসতে চাইলেন। তিনি যাত্রারীতিকে অনুসরণ করেননি, ভক্তিরসের পরিবর্তে অলৌকিক ঘটনার আধুনিক যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দানে সচেষ্ট হয়েছেন। মহাভারতের 'ভীষ্ম' (১৯১৪) চরিত্রকে নিয়ে তিনি যে নাটক লিখলেন তা প্রচলিত ধারণাকে আহত করে।

প্রায় একই বিষয় নিয়ে বিভিন্ন নাট্যকার ভিন্ন ভিন্ন নাটক লিখেছেন। ফলে নাটকগুলির মধ্যে সাদৃশ্য যেমন রয়েছে তেমনি বৈসাদৃশ্যও লক্ষণীয়। ভীষ্ম চরিত্রকে কেন্দ্র করে রাজকৃষ্ণ রায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নাটক রচনা করেছেন। মনোমোহন বসুর 'সতী' ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক দুটি দক্ষ ও শিবের পারস্পরিক রোষে সতীর আত্মদানের কাহিনি অনুসরণে রচিত। প্রহ্লাদ চরিত্র নিয়ে গিরিশচন্দ্র ও রাজকৃষ্ণ উভয়েই নাটক রচনা করেছেন। সাবিত্রী উপাখ্যান নিয়ে কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজকৃষ্ণ রায় ও ক্ষীরোদপ্রসাদ ভিন্ন ভিন্ন নাটক লিখেছেন। মনোমোহন বসুর 'পার্থপরাজয়' ক্ষীরোদপ্রসাদের 'বভ্রুবাহণ' বা 'উলূপী' নাটকের বিষয়ের সাদৃশ্য লক্ষকরার মতো। কাহিনির এই পৌনঃপুনিকতা থেকে সাধারণ ভাবে এটা স্পষ্ট হয় যে এই আখ্যানগুলি জনপ্রিয় ছিল এবং নাট্যকারগণ পূর্বে লিখিত নাটকে ব্যক্তিগত ভাবে তৃপ্ত ছিলেন না। একদিক দিয়ে এটা যেমন নাট্যকারদের সীমাবদ্ধতা আবার মহাকাব্যের বিচিত্র সম্ভাবনাময় কাহিনির ক্রমোন্মোচন যা যুগ যুগান্তরে নব নব আখ্যায় ব্যক্ত হয়ে চলেছে ভাবীকালের নাট্যপ্রতিভার অপেক্ষায়।